**মস্কোর বরফবিথী ও একজন সুতপা**

**পর্ব-৭**

আজ সকালটা খুব ফুরফুরে লাগছে।

বেশ ভালো ঘুম হয়েছে কাল। শরীর, মন-মেজাজ একদম ভালো। বাইরে ধল প্রহরের আলো জানালার কাঁচ দিয়ে উঁকি মারছে। নরম শীতল হাওয়ায় দুএকটি পাখি উড়ে যাচ্ছে মনে হলো। ইদানীং চমৎকার একটা অভ্যস হয়েছে। সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা। এমবাসী স্কুলে চাকুরি নেওয়ার পর থেকেই এই অভ্যাসটা শুরু হয়েছে। ৯টায় স্কুল শুরু। তাই ৮টার মধ্যেই বিছানা থেকে উঠে দ্রুত ট্রেনের মতো হাত-মুখ আর আনুসঙ্গিক নিত্য সকালের কাজগুলো সেরে ছুটতে হয়।কখনো-সখনো মুখে কিছু দেওয়ারও সময় থাকে না।

স্কুলে গিয়েই চা বিস্কুট দিয়ে এ কাজটা করে নেয় অপূর্ব।

মানব জাতটাই কি সুন্দর অভ্যাসের দাস। অথচ ক্লাস চলাকালীন সময় ইউনিভার্সিটিতে যেতে কতো না কষ্ট হতো, কতোনা তালবাহানা চলতো। এই নিয়ে আগরম বাগরম ভাবতে বেশ অবাকই লাগে। প্রায় দিনই প্রথম ক্লাশটা মিস হতো। তার জন্য কতোনা জ্বালানী- পোড়ানী। অনেক দিনই শিক্ষকের শাসানী আর ধমক শুনেছে-বিশেষ করে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের শিক্ষকের কাছে। নামটাও ছিলো তেজপ্রবন-সানিউক আন্দ্রে আন্দ্রেইভিচ।

একটা বদজাতের হাড্ডি-সবাই তাই বলতো। খুব শক্ত মেজাজের। ঠিক সময় ক্লাশে ঢুকতো।

অপূর্ব সোভিয়েত শিক্ষা-ব্যাবস্থা নিয়ে খুব গর্ব করতো। বিশেষ করে শিক্ষকদের সময়ানুবর্তিতার জন্য। কখনো কোন শিক্ষককে দেরী করে ক্লাশে আসতে দেখেনি। যতোই ঝড়-ঝঞ্জা বা শীতের তুষারপাতের উৎপাতই থাকুক না কেন। ক্লাশে দেরী করে আসাটা যেন একটা অসন্মানের ব্যাপার। তবে এই শিক্ষকটির একটি দোষ হলো পাথুরে মন, স্বভাবটাও তেমন। মুখ সবসময় গম্ভীর। যেন ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ। হাসির কোন বালাই নেই। হাসলেও মুখে বেমানান লাগতো। সারা মুখে বড়ো বড়ো বসন্তের দাগ। কেউ দেরী করে ক্লাশে ঢুকলে আর রক্ষা নেই। ইতিহাস আর দর্শনের খিস্তি-খেউরে অর্ধেক সময় পার করে দিত। উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা বিরক্তিভরে তার কথাগুলো মুখ বন্ধ করে সহ্য করতো। কিছু বলার জো নেই।

তবে সবাই জানতো সে খুব ভালো পড়ায়। সবাইকে খুব ভালো বাসে। সেটা পরীক্ষায় আসলেই বুঝা যেত। কেউ যেন পরীক্ষায় অসফল না হয় সেই চেষ্টাই করতো।

কখনো কেউ ক্লাশে না আসলে তাকে নিয়ে চিন্তা করতো। অন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতো কোন খবর জানে কিনা। এতো কঠিনতার মধ্যেও তার মানসিক উদ্বেগে সকলেই অবাক হতো।

আসলে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু বৈপরীত্ব থাকবেই

অপুর্বর বেলায়ও তাই-এটা অপূর্বরও উপলব্ধি

শুধু ওর বেলায় বা কেন? অনেকের বেলায়ই পড়াশুনার সময় ঘুম দেবী উড়ে আসে ঘুম পাড়ানিয়া গান শুনাতে। আর যখন লেখা-পড়ার কোন তাড়া থাকে না, তখন ঘুমের দেবী যেন অক্কা পায়। ঘুম হীন সময় কাটে নানা আজে বাজে কাজে।

আজ অপূর্ব স্কুলে যায় ফুর ফুরে মেজাজে। মেট্রো করে যেতে হয়। বাসে করে প্রথমে ইগো জাপাদনায়া। সেখান থেকে মেট্রো রেলে পার্ক কুলতুরা। এই ষ্টেশনটি অপূর্বর খুব প্রিয়। এখানেই প্রগতি প্রকাশনীর বিখ্যাত বইয়ের দোকানটি। কতোবার এখানে এসেছে বিশেষ করে খুব সস্তায় বাংলা বই কিনতে। এখান থেকেই লিও টলস্টয়ের আন্না কারেনিনা বাংলা অনুবাদেও বইটি কিনেছিল।

বইটি পড়ে অপূর্ব খুব কেঁদেছিলো। আন্নার হৃদয় বিদারক কাহিনীতে অপূর্ব বিগলিত হয়েছিলো। আন্না কারেনিনার ট্র্যাজেডি অপূর্বকে অনেকদিন যাবত ভাবিয়ে রেখেছিল।ভ্রনস্কি যা চেয়েছিলেন তা পেয়ে অবশেষে পরিপূর্ণতার একঘেয়েমি অনুভব করতে থাকে। আন্নাকে ছুড়ে দেয় এক ভয়ানক অনিচ্ছয়তার দিকে, তার আগের জীবন, তার সামাজিক অবস্থান, তার পরিবার, তার স্বামী এবং এমনকি সবচেয়ে দুঃখজনকভাবে তার ছেলেকেও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আনা তার অন্ধ আবেগের জন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত হতাশা আর যন্ত্রনায় ভরাক্রান্ত আন্না নিজেকে একটি ট্রেনের নীচে ফেলে দেয় এবং মারা যায়।

একি ভীষম সামাজিক দর্শন। আন্না যেন এই সমাজেরই একটি চলন্ত ট্রেন। একদিন হঠাৎ করেই তা থেমে যায় সমাজের বুকে বিষাদের কালো ছাপ রেখে। সামাজিক অনিয়ম, অসুস্থতা আর যন্ত্রনা দহনে ট্রেনটি যেন আর চলতে পারছি না।

তবে অপূর্বর জীবনে টলস্টয়ের প্রভাব বেশ শক্ত। আনা কারেনিনা আমাদেরকে বুঝতে উৎসাহিত করে যে আমরা কীভাবে আমাদের চোখের সামনে থাকা ছোট ছোট অনিন্দ্য সুন্দর জিনিসগুলি কিংবা মুহুর্তগুলি মিস করি। উপেক্ষা করি। অথচ আমরা সকলেই আমাদের সরল দৃশ্যে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া মুহুর্তগুলি দিয়ে সাঁজাতে পারি আমাদের জীবন। খুঁজে পেতে পারি বেঁচে থাকার নির্ভরতা।

এই মেট্রো ষ্টেশন থেকে পায়ে হেঁটেই অপূর্ব প্রায় সময় অ্যামবাসী স্কুলে যায়। ২০ মিনিটের পথ। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে ওর খুব ভালো লাগে। গতকালের কথাগুলি সমদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়িয়ে পড়ছে মনের বালুকাতটে। একটা সুখ অনুভব হয় হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটায়। এক উদাসী বাতাস বয়ে যায় ওর ভাবনায়।

-অপূর্ব এতো গভীর ভাবে কি ভাবছো?

চোখ তুলে দেখে অপূর্বর সিনিয়র আমিন ভাই। একই ডিপার্টমেন্টেই পড়াশুনা করে, একই হোষ্টেলে থাকে। ওদের সাথে বেশ সখ্যতা। পড়াশুনায় খুব ভালো। খুব দয়ার শরীর। সবাইকে খুব তাড়াতাড়ি ভালোবাসতে পাড়ে। জীবনে যেন কোন দুঃখ নেই। সব সময় মুখে একটা অর্ধ চাঁদের মৃদু হাঁসির রেখা ফুটে উঠে। একই ব্লকে থাকে। `দ` আকৃতির ব্লকের এক পাশের পাঁচ তলায় তার অবস্থান। সিঁড়ির সাথের প্রথম রুমটিতেই থাকতেন। প্রিপারেটেরী শেষ করে যেদিন প্রথম অপুর্ব মিখলুখা মাখলায়ার এই দুনম্বর ব্লকে আসে সেদিন আমিন ভাই রান্না করে অপুর্বকে ডেকে একসাথে খেয়েছিলেন। খুব গল্প হয়েছিলো সেদিন। ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের সম্পর্কেও অনেক কিছু বলেছিলেন।

তবে সেদিনের আমিন ভাই যেন আজ একটু অন্য রকম। অনেক কিছুতেই কেমন অনীহা। সোভিয়েত ইউনিয়নে চলছে এক রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা। মিখাইল গর্ভাচেভ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন শুরু হলো। সোভিয়েত বাসীর পরিচয় মেলে গ্লাসনস্থ আর পেরেস্ত্রইকার সাথে। বাক স্বাধীনতা আর সামাজিক পরিবর্তনের সামাজিক মন্ত্র। অনেকেই বলতো সুন্দর দেশটাকে ভেঙ্গে দেয়ার ষড়যন্ত্র। আমিন ভাইও দুঃখ করে বলতেন-

দেশটা এবার শেষ হয়ে যাবে। পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র এবার সফল হবে। গর্ভাচেভ একটা আমেরিকার দালাল।

আজ আমিন ভাইয়ের সাথে বেশ তিক্ত কথা-বার্তা হলো অপূর্বর।

দোষ কার সেটা কোন প্রশ্ন নয়, তবে কারো দূর্বল মুহুর্তে দূর্বল জায়গায় আঘাত করা অপুর্ব মোটেও পছন্দ করে না। যারা এই

জাতীয় কাজগুলি করে তাদেরকে ও একদম সহ্য করতে পারে না-অপূর্বর মনে ভাবনাগুলি ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়িয়ে পড়ছে।

অশান্ত মন-

আমিন ভাইও আজ অপুর্বকে এমন একটি জায়গায় আঘাত করেছে যা সহ্য করা দুরূহ। দু’একটি কথা শোনাতে বাধ্য হল।

আড্ডার কথাটা প্রথম শুনার পর কে কিভাবে নেবে অপুর্ব তা জানে না, তবে নিছক কিছু নিয়ে যে অযথা সময় কাটানো, এ কথাটা ভাবা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। মস্কোতে আড্ডা এ কথাটির যথেষ্ট ব্যাপকতা আছে। বলা মোটেও অমূলক হবে না যে মস্কোতে `আড্ডা` একটি সাহিত্য আসরের নাম। এখানে সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে গুরু গম্ভীর আলোচনা হয়। এখানে অধ্যায়নরত বাঙালী শিক্ষার্থীরা নিজস্ব লেখা নিয়ে আলোচনা সমালোচনায় লিপ্ত হয়। কথা-বার্তা হয়। একটি সৃষ্ট এবং সৃজনশীল উদ্যোগ।

এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে কেউ বলবে না যে আড্ডা একটি খারাপ ব্যাপার।

অথচ আজ আমিন ভাই এই আড্ডা কথাটি এমন বিকৃত উচ্চারনে অপুর্বর উপর প্রয়োগ করলেন যা ওকে ওর সত্তাকে যেন ধারালো ছুড়ির মতো আঘাত করলো।

অপুর্ব বির বির করে নিজের সাথেই বকতে লাগলো-

উনার ধারনা আমরা অযথা গল্প-গুজব করে সময় কাটাচ্ছি। আমাদের দ্বারা জীবনে কিছু হবে না।

-তোমরা হলে সব আড্ডাবাজের দল। পড়াশুনার নামে ঠন ঠন।

-কেন, এ কথা বলছেন কেন? সাহিত্য নিয়ে আড্ডায় খারাপের কি দেখলেন?

-পড়াশুনার দিকে একটু মন দাও।

আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না।

কথাগুলি শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছিল ভেতরটা। স্কুল না হলে হয়তো দুএকটা কথা বেশী শুনাতাম। কিন্তু পারলাম না।

এখন সাহিত্যের কথা শুনলেই অনেকের জ্বর আসে। কোন অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ বা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা হলেই অনেকে আবার কানে তুলা দিয়ে সাইড টক শুরু করে দেয়।

মস্কোতে অনেকে আছেন যারা সাহিত্য চর্চা করেন-কিন্তু সুষ্ট পরিবেশগত কারন, সুস্থ আলোচনা-সমালোচনার অভাব, ইত্যাদির

কারনে কারোরই সঠিক চর্চা হয়ে উঠছিল না। অনেকদিন যাবৎ আমাদের মধ্যে এই শূন্যতা লক্ষ করছিলাম। শেষ পর্যন্ত

কয়েকজনের উদ্যোগে একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কবি ফরহাদ ভাইয়র রুমে `আড্ডা` নামে এই সাহিত্য সভার আবির্ভাব হয়।

সেই দিন থেকে প্রতি শনিবার চলতো এই সাপ্তাহিক আড্ডার সভা। কিছুদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো বাঙালী শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর নাম। পরিচিতি পেল শনিবারের আড্ডা নামে। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো এর সদস্য সংখ্যা।

ভাবনায় আবার বজ্রাঘাত-

-আড্ডার কারনেই তোমার লেখাপড়ার দুরাবস্থা

আবার ফোড়ন কাটলেন বেশ তির্যক ভাবে।

কথাটি শোনার পর অপুর্বর কানে কেউ যেন গরম তেল ঢেলে দিলো।

কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে বেড়িয়ে গেল হন হন করে।

আজ স্কুলে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষকদের মিটিং ছিল।

স্কুলের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ -আলোচনা হলো। গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান যিনি অ্যামবাসীর ডিফেন্স সেক্রেটারী

শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েও আলোচন করলেন। আমাদের কোন প্রকার সমস্যা আছে কিনা সে ব্যাপারেও খোঁজ খবর

নিলেন।

বেশ খোলামেলা আলোচনা। যা আগে কখনো হতো না। মস্কোস্থ বাংলাদেশী ছাত্র সংঘঠনের সাথে আগে অ্যামবাসীর সম্পর্কটা একটু অন্যরকম ছিলো। দা-কুমড়া না হলেও খুব খাপছাড়া। কখনো সখনো নাজুক পরিস্থিতিতে গিয়ে ঠেকতো।

কিছুদিন আগে স্কুলের পুরাতন ষ্টাফরা বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ষ্ট্রাইকের হুমকি দিলে কোন কথা নেই-সাথে সাথে সব শিক্ষকদের

ছাটাই।

সব নতুন স্টাফ ঢুকেছে। অপুর্ব তাদেরই একজন। স্কুলের সব শিক্ষরাই মস্কোতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত।

সুতরাং আবারো এখন কিছু ঘটলে স্কুল চালানোটাই দায় হয়ে যাবে। বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদর মধ্যে অ্যামবাসীকে নিয়ে বেশ

অসন্তুষ্টির ভাব।

তার পর ঘটে যায় আরেকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মহান ভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে এক সিনিয়র ছাত্রের পঠিত প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে যে অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে গেছে তার পর থেকে কেউ অ্যামবাসেডরকে আর সহ্য করতে পারছে না।

কি ঘটেছিলো সেদিন।

২১শে ফেব্রুয়ারী। বাঙালী জাতীর আত্মচেতনতা ও অধিকার আদায়ের দিন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাইল ফলক। একুশ

আমাদের বিশ্বাসের তরু। আমাদের শক্তি ও প্রেরনার উৎস। উদ্দামতার বর্নমালা আর সাহসিকতার প্রতীক। তাই একুশকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরন করি। একুশ আমাদের অস্তিত্ব। তাই একুশের অবমাননা মানে বাঙালী জাতীর অবমাননা। শহীদ আত্মার অবমাননা। অথচ ঐদিন এক রাজনৈতিক প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে অ্যামবসেডার কি ন্যাক্কারজনক আচরনটাই না করলেন। রাজনৈতিক প্রবন্ধ একুশের অনুষ্ঠানে বিতর্কিত কিনা এটা প্রশ্ন নয় -একুশের অনুষ্ঠানে কেমন করে একজন সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ইংরেজীতে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, সভাপতির অনুমতি ছাড়াই অ্যামবাসীর সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সহ হল ত্যাগ করতে পারেন।

সেদিন বিকেলে অনুষ্ঠানের পর অপুর্ব রবিনকে সাথে নিয়ে চলে এলো সেতুর নাগরনায়ার বাসায়।

গিয়ে দেখে গৌতম ও সুমিতও ঐখানে। ওরা কলকাতার। ইন্জিনিয়ারিংএ পড়াশুনা করছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে। থাকে ১০ নম্বর ব্লকে। বাংলাদেশীদের সাথে উঠা-নামা বেশ। সেতুর সাথে ভাব-সাবটা একটু অন্যরকম। ভিসিআরএ গীত মালা দেখছে। বেশ জনপ্রিয় তখন। নতুন নতুন বলিউডের গানে সকলের একটু অন্যরকম মনযোগ। অপুর্বরও খুব প্রিয়।

সুতপা আর অপুর্ব কতোদিন সেতুর বাসায় গীতমালায় ডুবে থাকতো তার হিসেব নেই।

সেতু রান্না ঘরে ব্যাস্ত। সাথে আরো কেউ ছিলো। বুঝা গেলো খাওয়ার আয়োজনটা মন্দ নয়।

সেতুর ঐখানে অবশ্য একটা বিশেষ কাজে গিয়েছিল অপূর্ব। কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল। সকালেই সেতুকে ফোন করে টাকার কথা জানিয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়া করে রবিনকে সাথে নিয়ে অপূর্ব বেড়িয়ে পড়ল। সাতটার মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। পোষ্ট অফিসে যাবে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা মিখলুখা মাখলায়া।

তখন প্রায় সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। প্রায় সাড়ে ছটা বাজতে চললো। দিনের আলোর শেষ অন্ত। অন্ধকারে ধীরে ধীরে চাদর মুড়ি দিচ্ছে চারিদিক। গাড়ীগুলো বরফ গলা কর্দমাক্ত জলের উপর দিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ আওয়াজ তুলে গন্তব্যের দিকে সাঁ সাঁ করে এগুচ্ছে। রাস্তার পাশের নিয়ন বাতিগুলোর লাইট সাদা বরফের উপর আছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের আনাগোনা নাই বললেই চলে। বাইরে এখনো শীত জাঁকিয়ে বসেছে। আর কয়দিন পরেই সব কিছুর পরিবর্তন শুরু হবে। গ্রীষ্ম বাহারী রংএর পশরা নিয়ে আবির্ভাব হবে। মস্কোর গ্রীষ্মকালটা সত্যিই অন্যরকম। রাত ১১টার সময়ও আলো দেখা যাবে। দিন হবে সুদীর্ঘ। জীবনে ফিরে আসে নতুন চেতনা, আনন্দ আর উচ্ছ্বাস।

তবে এই মার্চ মাসটা অপুর্বর কাছে অপছন্দ। এই সময় মস্কোর তুষার বোঝাই রাস্তাগুলি অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করে, যার পরিবর্তে ঘন কাদার বিশাল জলপ্রবাহ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, যা মাঝে মাঝে বরফের প্রবাহের সাথে মিশে যায়। হাঁটতে গেলে সাবধানে পা ফেলতে হবে। যে কোন সময় বরফগলা কাঁদাজলে পা চলে গেলে বিপদ। পেন্ট-জুতার বাড়তি ঝামেলা। কখনো সখনো কনকনে শীতে বাতাসের উন্মাদনা শুরু হয়। এলোমেলো বাতাস গায়ে সুঁই এর মতো এসে বাঁধে। অপুর্বর অসহ্য লাগে।

হঠাৎ ঘ-র-র-র ঘ-র-র-র এক বিকট আওয়াজে অপুর্ব ঘাড় ফিরে তাকালো।

রবিনের নাক ডাকার শব্দ। এর মধ্যেই কি শান্তিতে ও ঘুমিয়ে পড়ছিলো। আর ঘুমের মধ্যে বিশ্রী ভাবে নাক ডাকা ওর অভ্যাস।

গাড়ী এসে থামলো।

রবিন ১০ নম্বর ব্লকে চলে গেল।

অপূর্বও চলে গেল পোস্ট অফিসে চিঠি তুলতে।

**(চলবে---)**

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট